রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' : রাজনৈতিক চেতনার অনালোকিত ভুবন

সৌরভ সাহা

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা"[১]

—নিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের জগতে আবির্ভাব গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল বাংলা ছোটোগল্প। রবীন্দ্রগল্পের মাধ্যমেই ঘটেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকার পরিবর্তন। এই সময়ই শিল্পীর জীবনদৃষ্টি পেল এক অনাবিষ্কৃত জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন "আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।"[২] যথার্থ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত মন্তব্য করেছেন। বাঙালি সমাজ বাস্তবতার নানান ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পগুলির মধ্যে। আঁতের কথা থেকে শুরু করে পশু-পাখি, মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, সময় প্রভৃতি হয়েছে তাঁর রচনার উপজীব্য। এছাড়া শিশু চরিত্রের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা রবীন্দ্র ছোটোগল্পের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলো তাঁর ছোটোগল্পের জগতে শতদল পদ্মের ন্যায় পত্রবিন্যাস করে থাকলেও রেণুর ন্যায় পাঠকদের অগোচরে রয়ে গেছে রবীন্দ্র ছোটোগল্পে স্বাদেশিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। মূলত প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেসব বিষয়ে আলোচনা করলেও ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা একেবারেই অনালোকিত বললেই চলে। কালের ইতিহাসে চাপা পড়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ফসল তথা রাজনৈতিক ছোটোগল্পের প্রতিনিধি স্থানীয় একটি গল্প 'রাজটিকা'। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায়।

'রাজটিকা' গল্পটি নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বে গল্পটির রচনাকাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কেননা গল্পের প্রেক্ষাপট, রচনাকাল ও তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে গল্প সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাভাস্য প্রস্তুত সম্ভবপর নয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস তথা ১৮৯৮ সালে 'রাজটিকা'

গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের ঠিক ৭ বছর আগে। যখন সমস্ত দেশ জুড়ে চলছিল ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ। ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কম্পানীর রাজত্ব, ভারতীয়দের পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের চিত্র নিয়েই রচিত 'রাজটিকা'। এই 'রাজটিকা' নামকরণটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এক রাজনৈতিক আবহের ছাপ রেখেছেন। সাধারণত 'রাজটিকা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিজয় বা রাজতিলক অর্থাৎ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা। এগল্পের শেষ লাবণ্যলেখার দ্বারা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নবেন্দুশেখরের স্বদেশীকরণই হচ্ছে লেখকের মতে রাজটিকা। গল্পটির প্রতিটি চরিত্র তৎকালীন সমাজের এক একটি সমাজ প্রতিনিধি। গল্পটিতে নবেন্দুশেখর ও তার শ্যালীকাদের যে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন তাতে মুখ্যত ধরা পড়েছে স্বদেশী ও ইংরেজ খেতাব লোভী ভারতীয়দের সংঘাতের চিত্র। সেখানে স্বদেশীর বিজয়কে লেখক 'রাজটিকা' সম্বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' যেন স্বাধীনতারই আগামবাণী।

'রাজটিকা' গল্পটির শুরুতেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে নবেন্দুশেখর চরিত্রটির সঙ্গে। লেখক নবেন্দুশেখরের পরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন "নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজরাজ সরকারে বিখ্যাত।"[৩] অর্থাৎ নবেন্দুশেখরের পিতা ইংরাজ সরকারের পরিচিত, শুধু তাই নয় পূর্ণেন্দুশেখর চরিত্রটি গল্পমাঝে প্রত্যক্ষ ভাবে না এলেও চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। তৎকালীন সমাজের ইংরেজদের অন্ধভক্ত তথা পদলেহনকারী ভারতীয়দের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র এই পূর্ণেন্দুশেখর। এর প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণেন্দুশেখর সম্পর্কিত এই মন্তব্য "...তিনি এই ভাবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরো দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু সেলাম শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।"[৪] উক্তিটির ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয়রা সামান্যতম সুবিধার জন্য নিজেদের জীবনসর্বস্ব উজার করে দিয়ে ইংরেজদের পদসেবা করত। ইংরেজদের প্রতি ভারতীয়দের অন্ধঅনুকরণ তথা দাসত্ব মনোভাব রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। স্বাজাত্যবোধ তাঁকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করত। রবীন্দ্রনাথের এই স্বাদেশিকতার পেছনে রয়েছে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ। যে পরিবেশে তিনি ছোটো থেকে বড় হয়ে উঠেছেন। যে স্বাদেশিকতার

উল্লেখ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'স্বাদেশিকতা' অংশে। উক্ত পাঠ্যাংশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের স্বদেশপ্রীতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন "আমার পিতাকে তাহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"[৫] তাছাড়া সমগ্র দেশ যখন দেশীয় ভাষা এবং দেশের ভাবকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সকলে তখন মাতৃভাষার চর্চা করছিলেন। এছাড়া হিন্দুমেলার বিভিন্ন স্বদেশী ভাবনামূলক বৈঠক প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বদেশীচেতনা জাগ্রত করে তুলেছিল।

নবেন্দুশেখর গল্পটির প্রধান চরিত্র হলেও প্রমথনাথ চরিত্রটি এই গল্পের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত খেদ, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে এই প্রমথনাথ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। প্রমথনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অন্ধভক্তদের মোহভঙ্গ দেখিয়েছেন। গল্পের শুরুর দিকে আমরা দেখি যে প্রমথনাথ বিদেশী আদবকায়দা ও বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলেন "কি করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব।"[৬] দেশীয় ইংরাজ মহলে সামান্য প্রতিপত্তি লাভের জন্য তিনি বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ থেকে সাদর পত্র এনে ভারতীয় ইংরাজ মহলে দেখাতে লাগলেন এবং তদসঙ্গে ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা হাস্যকৌতুকে সস্ত্রীক কিঞ্চিৎ ভাগ পেতে লাগলেন। কিন্তু এই অন্ধমোহ তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হল না। যখন প্রমথনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন যে ইংরেজরা মূলত তাঁকে নয় তাঁর গায়ে থাকা বিলাতি পোশাককে সম্মান প্রদর্শন করে, তখন লজ্জায় ও ধীক্কারে তাঁর মাথা নত হয়ে যায়। মনে মনে সে উপলব্ধি করে "গর্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি আমি আজ বুঝিয়াছি সম্মান আমাকে নহে আমার স্কন্ধের বোঝাগুলোকে।"[৭] এই প্রমথনাথ এখানে হয়ে উঠেছেন ভারতীয় অন্ধভক্তদের প্রতিনিধি। আত্মোপলব্ধির পরমুহূর্তেই আমরা প্রমথনাথের মধ্যে স্বদেশিকতার জাগরণ দেখি। তিনি বাড়ি ফিরে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতিস্বরূপ তাতে নিক্ষেপ করেন। যা পরবর্তীকালে মহাত্মাগান্ধীর বিদেশী বর্জন তথা স্বদেশী আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। যার ছবি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই 'রাজটিকা' গল্পে তুলে ধরেছেন প্রমথনাথ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

ব্রিটিশরা একসময় কিছু সংখ্যক ভারতীয় অন্ধভক্তদের কাছে দেবতুল্য হয়ে উঠেছিল— যার ব্যঙ্গ রূপ প্রকাশ পেয়েছে নবেন্দুশেখরকে ঘিরে শ্যালীদের ঠাট্টার মাধ্যমে। যেখানে জ্যেষ্ঠা শ্যালী লাবণ্যলেখা নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুইজোড়া বিলাতি বুট সিন্দুর মাখিয়ে; ফুল চন্দন দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে রেখেছে এবং

নবেন্দুকে বলেছে "তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"[৮] তৃতীয় শ্যালী কিরণলেখা একটি চাদরে জোন্স, স্মিথ, ব্রাউন, টমসন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরেজি নাম সুতো দিয়ে সেলাই করে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দেয়। চতুর্থশ্যালী শশাঙ্ক লেখা নবেন্দুকে সাহেবদের নাম জপ করবার জন্য জপমালা তৈরি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মূলত ইংরেজদের প্রতি থাকা নবেন্দুর অন্ধবিশ্বাস, স্বদেশের প্রতি থাকা অবজ্ঞা প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছে তৎকালীন সমাজের ব্রিটিশ পদলেহনকারী ভারতীয়দের ছবি। যারা নিজের সামান্য খ্যাতি তথা উন্নতির জন্য দেশমাতৃকাকে অবজ্ঞা করে ব্রিটিশদের দেবতাদের আসনে বসিয়েছিল।

এই ব্রিটিশদের পদলেহনকারীরা যে ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও দুর্বল ছিল সে দিকটির উদ্‌ঘাটন রবীন্দ্রনাথ নবেন্দুশেখর চরিত্রটির মধ্যে দেখিয়েছেন। তাই আমরা গল্পমাঝে দেখি নবেন্দুশেখর "বড়ো সাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।"[৯] দার্জিলিং থেকে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করতে যাবার সময় শ্যালীদের বলা যেত, "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"[১০] নবেন্দুর এই ভীত ও দুর্বলতা সমগ্র পরাধীন ভারতের দুর্বলতার প্রতীক। এই দুর্বলতা ও ভীতি ধীরে ধীরে এতোটাই প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যে সামান্য পরিহাসের সত্যতা নিরুপণও তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রতি থাকা আস্থা তথা অন্ধবিশ্বাস তাকে এতোটাই গ্রাস করে ফেলে যে হিতাহিত জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে বিচার শক্তি শূন্য হয়ে লাবণ্যের পরিহাসে ছুটে যায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়েও নবেন্দুর গোল বেধে যায়। শুধু একটা কথাই তার কানে বাজতে লাগল, "Babu, you are a howling idiot!"[১১]। সাহেবের এই উক্তির মধ্য দিয়ে যেন নবেন্দুর মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয়দের চরিত্র উদ্‌ঘাটন হল। ভারতীয়রা যে সেসময় কতটা নির্বোধ ছিল সাহেবের উক্তি তারই প্রমাণ।

অপরদিকে লাবণ্যলেখা চরিত্রটির মধ্যে আমরা স্বদেশীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। নবেন্দুকে বক্সারে এনে পারিবারিক রঙ্গ তামাসার মাধ্যমে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করার যে প্রয়াস তা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস পন্থার কথাই আমাদের স্মরণ করায়। লাবণ্যের এই প্রচেষ্টায় নবেন্দুর একটি বিষয়ে সংশোধন হয়। লাবণ্যের স্নেহে সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে ভুলে গিয়ে আত্মীয় স্বজনদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের সেটাই নবেন্দু সর্বান্তঃকরণে অনুভব করছিল। লাবণ্যের এই প্রচেষ্টা যেন স্বদেশীদের দ্বারা পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে স্বাজাত্যবোধ জাগরণের প্রতিচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহনকারী বিষয়টি হল

কংগ্রেস কমিটির প্রসঙ্গ। যা গল্পমধ্যে এক রাজনৈতিক বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। স্বদেশীচেতনা জাগরণ তথা দেশীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কংগ্রেস কমিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পরোক্ষ ভাবে ছলে-কৌশলে নবেন্দুশেখরের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি করে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ধীরে ধীরে স্বদেশীকরণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ আরও একটি রাজনৈতিক সত্য এখানে তুলে ধরেছেন। যেখানে বলেছেন "আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া ওঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত গভর্মেন্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্বোদ্ধত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়।"[১২] পরিণত হয়েছিল তেমনি কিছু অর্থলোলুপ স্বার্থপর ভারতীয়দের জন্যই ভারত ইংরেজ শাসনাধীন হয়েছিল। এই চরম সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের পদবী লোলুপতা, তোশামোদ প্রিয়তা, স্বদেশীদের প্রতি অবজ্ঞা হিংসা এই সকল রাজনৈতিক আবহকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' গল্পটির অবতারণা।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নবেন্দুশেখরকে সাহেবী খেতাব লাভের মোহজাল থেকে কৌশলে বের করে এনে কংগ্রেস কমিটিতে যোগদান করিয়ে লাবণ্যলেখা কোলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে নিয়ে আসে। মহারাণীর জন্মদিনে নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব লাভের আশা মরীচিকার মতো অন্তর্ধান হলে লাবণ্যলেখা নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক নববস্ত্রে ভূষিত করে, কপালে রক্তচন্দনের তিলক লাগিয়ে পুষ্পমালা পরিয়ে বরণ করে বলে "আজ আমরা তোমাকে রাজা করে দিলাম ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।"[১৩] শ্যালীদের দ্বারা নবেন্দুর রাজটিকা হল। অর্থাৎ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান থেকে তাকে স্বদেশীকরণ করা হল। যাকে রবীন্দ্রনাথ রাজটিকা বলেছেন। মূলত দেশীয় সম্মান, স্বদেশবাসীর প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, স্বাজাত্যবোধের চেয়ে সম্মানীয় ও গৌরবের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তাই নবেন্দু যখন সাহেবী আদবকায়দা তথা অন্ধমোহ ছেড়ে স্বজাতিদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে স্বদেশী হয়ে উঠল তখনই তার প্রকৃত জয় লাভ তথা রাজতিলক তথা রাজটিকা প্রাপ্তি হল।

পরাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ শাসিত সমাজের নানান চিত্র রবীন্দ্রনাথ 'রাজটিকা' গল্পে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে পরধীন ভারতবাসীদের অর্থ ও যশ লোলুপতা, পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, ব্রিটিশদের অন্ধঅনুকরণ, স্বদেশিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি নানান চিত্রের সমাবেশে গড়ে তুলেছেন 'রাজটিকা'। একটি পারিবারিক কাহিনি এতে বর্ণিত হলেও সেই পারিবারিক কাহিনির অন্তরালে ফুটে উঠেছে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালের ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ছবি।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সোনারতরী', প্রকাশক-তপনকুমার বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ-১৪২৩, পৃষ্ঠা-২৫

২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১০

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', প্রকাশক নির্মল কুমার সাহা প্রথম সংস্করণ কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪৮

৪. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৪৮

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুনমুর্দ্রণ বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ৮৬-৮৭

৬. গল্পগুচ্ছ, পৃষ্ঠা ৩৪৮

৭. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৪৯

৮. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫০

৯. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫০

১০. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫০

১১. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫৫

১২. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫৩

১৩. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৩৫৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

২. 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রাবণ-১৪৩৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৩. রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, তপোব্রত ঘোষ দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭

৪. 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' নরেন্দ্রনাথ রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ দেবাশিস ভট্টাচার্য, জন্মাষ্টমী ২০১১

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' প্রকাশক নির্মল কুমার সাহা, প্রথম সংস্করণ কলকাতা বইমেলা ২০০৩

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি' বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ পুনমুর্দ্রণ : বৈশাখ ১৪০১। কলকাতা-১৭।